بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১২ জুন, ২০২৬ মোতাবেক ১২ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

(সূরা আল-বাকারাহ্: ২৭৫)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔(সূরা আয-যারিয়াত: ২০)

প্রথম যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা বাকারা থেকে নেওয়া। এর অনুবাদ হলো, **যারা নিজেদের ধনসম্পদ দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না।**

আর দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আয-যারিয়াতের। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আর তাদের ধনসম্পদে সাহায্যপ্রার্থীদেরও অধিকার রয়েছে এবং যারা সাহায্য চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার রয়েছে।**

আজ আমি মহানবী (সা.)-এর উদারতা ও বদান্যতা সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। তিনি (সা.) কীভাবে বার বার মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এব তাঁর নিজের ব্যবহারিক আদর্শও কেমন ছিল– তা এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এই আয়াতদ্বয় যা আমি পাঠ করেছি, এতেও এবং অন্যান্য অনেক আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন এবং অভাবীদের চাহিদা মেটানোর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই নির্দেশের আলোকে মহানবী (সা.) প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিও এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন আর সর্বোপরি নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের জীবনাদর্শের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ব্যবহারিক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অতএব কেবল একটি বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র কুরআন সম্মত ছিল। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ অর্থাৎ তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন সম্মত। যে-কোনো বৈশিষ্ট্যের দিকেই তাকান না কেন, তিনি ছিলেন এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যার চেয়ে উন্নত আর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে না। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, আজ তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতার বরাতে কিছু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই বাক্যাবলি পাঠ করে দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ। অর্থাৎ, **'হে আল্লাহ্! আমি কার্পণ্য, আলস্য, নিকৃষ্ট জীবন, কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুসংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'** একইভাবে এ বিষয়ে এই দোয়াটিও রয়েছে (যা) হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এই দোয়াটি করতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ। অর্থাৎ,

‘হে আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা’লার রাস্তায় এবং বান্দাদের সাহায্য করার বিষয়ে তিনি (সা.) মু’মিনদের এই উপদেশও দিয়েছেন। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, **‘থলের মুখ বেঁধে রেখো না। খোলো (তথা খরচ করো), অন্যথায় তোমাকেও তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।’** অর্থাৎ, তুমি তোমার সম্পদ যাতে জমা করে রেখেছ তার মুখ বেঁধে রেখো না বরং প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে থাকো এবং অন্যদের সাহায্য করো। আরেকটি রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো রয়েছে, **‘গুনে গুনে দিও না, অন্যথায় আল্লাহ্ তা’লাও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন।’** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা’লা যদি তোমাকে স্বীয় দানে ধন্য করে থাকেন তাহলে তুমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করো। আর কৃতজ্ঞতা হলো অন্যদের সাহায্য করো, (তাহলে) আল্লাহ্ তা’লা তোমাকে সমধিক দানে ধন্য করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **‘দানশীল আল্লাহ্র নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে কিন্তু আগুন (বা জাহান্নাম) থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে কিন্তু আগুনের (জাহান্নামের) নিকটে। আর একজন দানশীল মূর্খ ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা’লার নিকট কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক প্রিয়।’** কৃপণ ব্যক্তি ইবাদতকারী হলেও তার তুলনায় একজন মূর্খ দানশীলকে আল্লাহ্ তা’লা বেশি পছন্দ করেন।

একইভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **‘ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’** এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো: প্রতারক, কৃপণ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কাউকে বেশি খোঁটা দেয়– তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একইভাবে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **‘মু’মিন সরল ও দানশীল হয়ে থাকে, আর পাপাচারী হয় প্রবঞ্চক ও ইতর।’** সরলপ্রাণ বলতে এটি বোঝায় না, যেমনটি আমাদের ভাষায় কিছু লোক মনে করে যে, সরলমনা অর্থ হলো নির্বোধ; সত্য কথা হলো, মু’মিন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মু’মিন তো প্রজ্ঞায় অনেক সমৃদ্ধ থাকে এবং মু’মিনের প্রজ্ঞারও অনেক গুরুত্ব রয়েছে; তা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। এখানে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, সে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলে, দয়ালু, অনেক উদার মনের অধিকারী এবং মানুষের কাছে পছন্দনীয় ও সম্মানযোগ্য। কাজেই, এটি হলো মু’মিনের বৈশিষ্ট্য এবং এটি হলো আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করার জন্য একটি মানদণ্ড।

মুতাররিফ (রা.) তাঁর পিতার বরাতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই, তখন তিনি (সা.) **‘আলহাকুমুত্ তাকাসুর’** [অর্থাৎ সূরা তাকাসুর] পাঠ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, **আদম সন্তান বলে, ‘আমার সম্পদ, আমার সম্পদ!’** *অর্থাৎ মানুষ একথা বলে, ধনাঢ্য ব্যক্তি একথা বলে যে, ‘এগুলো আমার সম্পদ, আমার সম্পদ!’* তিনি (সা.) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ তো কেবল তা-ই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ, পরিধান করে পুরোনো করেছ অথবা সদকা দিয়েছ এবং (পরকালের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করেছ। তিনি (সা.) বলেন, সবচেয়ে উত্তম সম্পদ সেটিই যা তুমি সদকা হিসেবে দিয়েছ এবং তা তুমি আল্লাহ্ তা’লার সমীপে তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য দিয়ে দিয়েছ, তাঁর পথে খরচ করেছ। এই সম্পদই তুমি পরকালে বহুগুণ বর্ধিত আকারে পাবে। এজন্যই আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, তাদের কোনো ভয়

থাকবে না, *অর্থাৎ যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে,* এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না; কারণ তারা যে-সব কুরবানী করেছে, যে দান-খয়রাত তারা করেছে, যে সম্পদ তারা অন্যদের পেছনে ব্যয় করেছে– তা তারা পরকালে পাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **কেবল দুটি ক্ষেত্রেই ঈর্ষা করা বৈধ। একটি হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দেন এরপর তাকে যথাস্থানে অকৃপণভাবে তা খরচ করার সামর্থ্য দেন; এবং অপর ব্যক্তি সে যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তদনুযায়ী বিচার করে ও কর্ম সম্পাদন করে এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দেয়।**

অতঃপর এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **হে আদম সন্তান! তোমার নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা তোমার জন্য উত্তম।** *আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তোমার যে-সব প্রয়োজন রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূরণ করো; কিন্তু অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে– সেটি (অন্যের জন্য) ব্যয় করো।* আর তা কুক্ষিগত করে রাখা তোমার জন্য মন্দ, তবে তোমাকে প্রয়োজন অনুসারে নিজের কাছে রাখার কারণে তিরস্কার করা হবে না। *চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ নিজের কাছে রাখলে সেটির জন্য কোনো জবাবদিহি করা হবে না যে, কেন সম্পদ রেখেছ!* আর যার লালনপালনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত– তার জন্য খরচ করার মাধ্যমে একাজ শুরু করো। *অর্থাৎ খরচ করার রীতি হলো, তোমার যে-সব দায়িত্ব রয়েছে, তোমার সন্তানাদি, তোমার স্ত্রী-সন্তান, তোমার দরিদ্র আত্মীয়স্বজন, অথবা যাদের লালনপালনের দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে, তারা তোমার সম্পদ থেকে সাহায্য পাবার ক্ষেত্রে প্রথম অধিকার রাখেন।* অতঃপর তিনি (সা.) বলেছেন, **আর ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ বেশি প্রিয়? *এমন কেউ আছে কি যে বলবে, আমার উত্তরাধিকারীকে যে সম্পদ আমি দিয়ে যাচ্ছি– তা আমার কাছে আমার নিজের কাছে রাখা সম্পদ বা নিজের জন্য খরচ করা সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয়?* লোকেরা বলে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যার কাছে নিজের সম্পদ বেশি প্রিয় নয়।** তিনি (সা.) বলেন, **তাহলে তার সম্পদ তা-ই যা সে অগ্রে (পরকালে) প্রেরণ করেছে এবং তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ তা-ই যা সে পেছনে রেখে গেছে।** *যা তুমি অগ্রে প্রেরণ করেছ, (তথা) আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করেছ, দরিদ্রদের সাহায্য করেছ, তা-ই সবচেয়ে উত্তম। পরকালে তুমি এর প্রতিদান পাবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।*

সম্পদ অকৃপণভাবে খরচ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা রাখার বিষয়ে তাঁর (সা.) নিজের ব্যবহারিক আদর্শ কেমন ছিল– এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বেলালের (রা.) কাছে আসেন, তখন তার কাছে খেজুরের একটি স্তূপ রাখা ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, বেলাল! এগুলো কী? হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এগুলো আমি আপনার জন্য এবং আপনার অতিথিদের জন্য জমা করে রেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, তোমার কি ভয় হয় না যে, এই স্তূপীকৃত সম্পদের ওপর জাহান্নামের আগুনের হলকা এসে লাগতে পারে? অতঃপর তিনি

(সা.) বেলাল (রা.)-কে উপদেশ দেন, হে বেলাল! খরচ করতে থাকো এবং আরশের অধিপতি খোদা থাকতে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এ বিষয়ে তাঁর (সা.) নিজের আদর্শের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তিনি একটি ছাগল জবাই করান এবং এর মাংস গরিবদের মাঝে বণ্টন করেন এবং বাড়িতে খাওয়ার জন্যও কিছুটা রেখে দেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, **কতটুকু মাংস অবশিষ্ট আছে?** হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, **শুধু সামনের পা রয়ে গেছে।** *অর্থাৎ ছাগলের সামনের পায়ের রান বা অংশটি রয়েছে।* একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **এই সামনের পা বাদ দিয়ে তুমি যা বণ্টন করেছ তার পুরোটাই সুরক্ষিত হয়ে গেছে।** *কারণ এটি অন্য কারও কাজে আসে নি, আমাদের খাওয়ার জন্য তুমি রেখেছ। পরকালে সেটিই কাজে আসবে যা তুমি (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করেছ।*

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভাষণ প্রদানের সময় বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, **আমি তো কেবল বণ্টনকারী আর আল্লাহ্‌ই দান করেন।** [সহীহ্ বুখারী]। দানশীলতা ও বদান্যতার বৈশিষ্ট্য মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তায় (তাঁর) আবির্ভাবের পূর্বেও পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং এর সাক্ষ্য– যেমনটি আমরা পড়ে থাকি– তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রা.) সেই সময় দিয়েছিলেন যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি (সা.) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসেছিলেন; তখন হযরত খাদিজা (রা.) বলেছিলেন, **ভয় পাবার প্রয়োজন নেই; আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, এমন সব পুণ্যকর্ম করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যিকার বিপদে নিপতিত মানুষকে সাহায্য করেন।**

এরপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, দুটি অভ্যাস মু'মিনের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না– কৃপণতা এবং অসদাচরণ। অর্থাৎ, যে মু'মিন তার মাঝে কৃপণতাও থাকবে না, অসদাচরণও থাকবে না। এটিও নিজেকে যাচাই করার একটি মাপকাঠি। এরপর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, অন্যায় থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই অত্যাচার-অন্যায় কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। আর কৃপণতা ও লোভ থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল। এই কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা রক্তপাত করেছিল এবং হারাম জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোনো বান্দার জীবনে কখনও আল্লাহ্‌র পথের ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হতে পারে না, আর কোনো বান্দার হৃদয়ে কখনও লোভ, কৃপণতা এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না। যেমনটি আগেও একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, লোভী ও কৃপণ কখনও মু'মিন হতে পারে না। সুতরাং এটি হলো মাপকাঠি; মু'মিন হতে হলে লোভ থেকেও বাঁচতে হবে, লালসা থেকেও বাঁচতে হবে এবং কৃপণতা এড়িয়ে চলতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই যখন বান্দাদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। তাদের মধ্যে একজন বলে, হে আল্লাহ্! খরচকারীকে এর বিনিময় দান করো। আর অপরজন বলে, হে আল্লাহ্! কৃপণের সম্পদ বিনষ্ট হোক। *অর্থাৎ যে খরচ করছে, তার বিনিময়ে তাকে আরও*

দাও; আর যে কৃপণতা করছে, তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। এই জগতেও সেই সম্পদে বরকত হয় না– এটাই আমরা দেখি, অনেক মানুষ এই কথাই প্রকাশ করেন; আর পরকালেও এই সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তা'লা এক জায়গায় বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর ভালোবাসার খাতিরে খরচ করে, তিনি এর প্রতিদান দেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী। একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে; হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সকল দানশীলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানশীল সম্পর্কে জানাব না? এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ হলেন সমস্ত দানশীলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানশীল, আর আদম সন্তানদের মাঝে আমি সবচেয়ে বেশি দানশীল। *অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি উদার আমি।* একইভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতার ক্ষেত্রে সকল মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন এবং রমযান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি উদারতা প্রদর্শন করতেন। জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর রমযানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, যতক্ষণ না রমযান শেষ হতো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দয়াদাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে প্রবল বেগে বয়ে চলা বাতাসের চেয়েও বেশি উদারতা প্রদর্শন করতেন। তিনি এমনভাবে খরচ করতেন যেন ঝড়-তুফান বয়ে যাচ্ছে।

এই বিষয়টিকেই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবায় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (সা.) দান করতেন তখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ের হতো। এমনকি সাহাবীদের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) বিশেষ করে রমযানে এমনভাবে দান করতেন যেন প্রবল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর এর পাশাপাশি وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৭)-নির্দেশও তিনি মেনে চলতেন; অর্থাৎ উদারতাকে নিরর্থক নষ্ট হতে দিতেন না এবং বেমানান বা অনুপযুক্ত স্থানেও তা ব্যয় করতেন না। উদারতা ছিলই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশও রয়েছে যে, অপব্যয় করা যাবে না, অকারণে নষ্ট করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা অপব্যয় করতে বারণ করেছেন। হাতেম তাঈ-এর মাঝে উদারতা ছিল, কিন্তু তা ছিল স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে। হাতেম তাঈ অনেক বড়ো দাতা হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তার দানশীলতা পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা অনুযায়ী হতো না, বরং চিন্তাভাবনা ছাড়াই হতো; কারণ তা ছিল 'মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকানে বসে দাদার নামে ফাতিহা পাঠের' [অর্থাৎ অপরের অর্থে দানশীল সাজার] মতো বদান্যতা। নিজের কোনো সম্পদ নেই, বাবার সম্পদের ওপর তার কীই-বা অধিকার ছিল যে, সে তা বণ্টন করে দেবে? হাতেম তাঈ সম্পর্কে বলা হয়, শৈশব থেকেই তার স্বভাবে উদারতা ছিল। অবশেষে তার বাবা যখন দেখলেন, সে তো আমার সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে, তখন তিনি তাকে উটের দেখাশোনার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। একদিন সে দেখল, তিনজন লোক এসেছে, তারা ছিল বড়ো তিনজন কবি। সফরে তারা তাকে দেখতে পেল। তখন তাদের আতিথেয়তার জন্য সে তিনটি উট জবাই করে দিল। তারা বলল, আমরা তিনজন মানুষ, একটি উটই তো যথেষ্ট! সে বলল, না, আমি যদি একটি জবাই করি তবে বাকি দুইজন পরজীবী গণ্য হবে। বাবার সম্পদ তো ছিল; বিনামূল্যে পেয়ে তাদের জন্য সে তিনটি উটই জবাই করে দিল। কিছু মাংস হয়ত বেঁচে গিয়েছিল, বাকিগুলো নষ্ট হয়েছিল বা কাউকে সম্ভবত দিয়ে দিয়েছিল। তার পিতার এটি খুব অপছন্দ হয় যে, আমার সম্পদ এভাবে

উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে যে সম্পদ আসত, তা তাঁরই সম্পদ হতো এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে তিনি (সা.) তা ব্যয় করতেন।

এখানে সেইসব হাদীসের ব্যাখ্যাও এসে গেছে যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন, অকৃপণভাবে খরচ করো। এর অর্থ হলো, পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে খরচ করো, আর তখন কোনো ধরনের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, জঙ্গলে তিনজন মানুষ এসেছে, আর তিনটি উট জবাই করে দেবে এবং পরে সেগুলোর মাংস নষ্ট হয়ে যাক। কারণ, সেখানে তো খাওয়ার মতো আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই জঙ্গলে আর কাউকে পাওয়া যায় নি। যদি দু-একজন থাকতোও তবুও কিছু না কিছু, বরং অনেকটা মাংসই বেঁচে গিয়েছিল, যা নষ্ট হয়েছে। এতে কোনো লাভ নেই। তাই পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। যদি আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করে থাকো এবং পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা অনুযায়ী খরচ করে থাকো, তবে নিশ্চিন্ত থাকো। কারণ এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি, যেমনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাদের কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। যা-ই হোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর বিপরীতে মহানবী (সা.) একদিকে তো এতটা দানশীল ছিলেন যে, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, সাহাবীগণ (রা.) বলেন, রমযানের দিনগুলোতে তিনি (সা.) এমনভাবে দান করতেন যেন প্রবৃল ঝড়োবায়ু বইছে, কিন্তু অন্যদিকে তিনি ভেবেচিন্তে খরচ করার মানুষ ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার কাছে যদি তিহামা পর্বতমালার, *অর্থাৎ আরবের উপকূলীয় পর্বতমালার* সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তবে আমি তার সবটাই তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বা কৃপণ হিসেবে পাবে না।

একটি রেওয়াতে রয়েছে, হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে মদীনার সমতলভূমিতে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে চলে আসে। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু যর! আমি বলি, লাব্বাইক, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তিনি (সা.) বলেন, আমাকে এই বিষয়টি আনন্দিত করে না যে, আমার কাছে এই উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকবে আর তিন রাত অতিবাহিত হবার পরও তা থেকে একটি দিনারও আমার কাছে মজুত থাকবে; তবে সেই অংশটুকু ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দেবো; বরং আমি অবশ্যই তা আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে এইভাবে, এইভাবে এবং এইভাবে খরচ করে দেবো– *তিনি (সা.) হাঁটতে হাঁটতে নিজের ডানে, বাঁয়ে এবং পেছন দিকে ইঙ্গিত করেন* এবং এরপর বলেন, যারা অনেক সম্পদশালী, কিয়ামতের দিন তারাই হবে নিঃস্ব। অর্থাৎ যারা সম্পদশালী, টাকা-পয়সা জমা করতে থাকে, অভাবগ্রস্ত ও গরিবদের জন্য খরচ করে না, তারা কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। তবে সে নয়– যে এভাবে, এভাবে, এভাবে খরচ করে। যে ব্যক্তি খরচ করছে, অর্থাৎ নিজের ডানে, নিজের বাঁয়ে এবং নিজের পেছন দিকে খরচ করে, সে কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে না। আর তাদের সংখ্যা নেহাতই কম। তিনি (সা.) বলেন, এমন লোক খুবই কম যারা এইভাবে আল্লাহ্র পথে খরচ করে। যারা সম্পদশালী মু'মিন, তারা কৃপণতা করে না; বরং আল্লাহ্র পথে একজন সম্পদশালী মু'মিন নির্ভয়ে খরচ করে থাকে, আর তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আরও বেশি দান করতে থাকেন।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকা সমস্ত ছাগলপাল চেয়ে বসে এবং তিনি (সা.) তাকে তা দিয়ে দেন। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং বলে, হে আমার সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) তো এত বেশি দান করেন যে, দারিদ্র্যের ভয় থাকে না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, অনেক সময় কোনো কোনো ব্যক্তি কেবল জাগতিক স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করত; কিন্তু যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করত, তখন ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠত।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আগামীকালের জন্য কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না। হযরত উকবা বিন হারিস (রা.) বর্ণনা করেছেন, (একদিন) মহানবী (সা.) আমাদের আসরের নামায পড়ালেন, এরপর তিনি (সা.) তাড়াতাড়ি বাড়িতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরই বাইরে বেরিয়ে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘরে সদকার সম্পদের মধ্য থেকে স্বর্ণের একটি টুকরো রেখে এসেছিলাম। আমি পছন্দ করি নি যে, সেটি সারা রাত আমার কাছে থাকবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দিয়েছি।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে আসেন এবং তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি ভাবলাম, কোনো কষ্ট বা ব্যথার কারণে এমন হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার চেহারার রঙ পরিবর্তিত দেখতে পাচ্ছি। কোনো কষ্টের কারণে কি এমনটা হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, না, সেই সাতটি দীনারের কারণে (এমনটি হয়েছে) যা সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসেছিল এবং রাত পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা সেগুলো খরচ করি নি। আমি বিছানার এক কোণে সেগুলো রেখে ভুলে গিয়েছিলাম আর যখন আমার মনে পড়ল, তখন এ বিষয়ে আমার ভীষণ চিন্তার উদ্রেক হলো।

হযরত উকবা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পেছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। তিনি (সা.) সালাম ফেরালেন এবং তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন আর মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের কক্ষের দিকে গেলেন। মানুষ তাঁর এই তাড়াহুড়ো দেখে ঘাবড়ে গেল। এরপর তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন, তারা তাঁর এই তাড়াহুড়ো দেখে বিস্মিত হয়ে আছে। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার কাছে কিছু স্বর্ণ ছিল, যার কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি এটি পছন্দ করি নি যে, তা আমাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দেবার জন্য বলে এসেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর কাছে যা-ই থাকত তিনি তা দান করে দিতেন। একবার তাঁর ঘরে একটি মোহর ছিল, তিনি সেটি নিয়ে বণ্টন করে দিলেন। এই ঘটনারই উল্লেখ করে অন্য এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে লিখেছেন:

একবার সদকার কিছু অর্থ আসে এবং তা বণ্টন করার সময় একটি দিনার কোনো এক কোণায় পড়ে যায়, যা তুলে নেবার কথা তাঁর মনে ছিল না। নামাযের পর মনে পড়লে তিনি লোকদের ঘাড় ডিঙিয়ে দ্রুত নিজের ঘরে চলে যান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কী ব্যাপার ছিল? তিনি বলেন, এভাবে একটি দিনার বণ্টন করা বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি চাইলাম, যত দ্রুত সম্ভব সেটিও যেন বণ্টন করে দিই। মোটকথা,

ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন উদারতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করেছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, যা-ই আসত তিনি তা আল্লাহ্ তা'লার পথে বণ্টন করে দিতেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে ধনসম্পদ আনা হয়। তিনি বলেন, এটি মসজিদে রেখে দাও। এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধনসম্পদ যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আনা হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযের জন্য বের হন এবং সেটির দিকে কোনো মনোযোগ দেন নি, অর্থাৎ সেদিকে তাকান নি। তিনি যখন নামায শেষ করেন তখন তিনি গিয়ে সেই ধনসম্পদের কাছে বসেন এবং যাকে দেখছিলেন তাকেই দান করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে হযরত আব্বাস (রা.) আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকেও দিন, কারণ বদরের দিন আমি নিজের মুক্তিপণ দিয়েছিলাম এবং আকীলেরও মুক্তিপণ দিয়েছিলাম। ইনি ছিলেন হযরত আব্বাসের ভাতিজা আকীল বিন আবু তালিব। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, এর মধ্য থেকে নিয়ে নাও। তখন তিনি দুই হাতে ভরে ভরে নিজের কাপড়ে ঢালেন; তারপর তা ওঠাতে চাইলেন কিন্তু ওঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কাউকে আদেশ করুন যেন এটি আমাকে তুলে দেয়। তিনি বলেন, না, তা হতে পারে না। তিনি বলেন, তাহলে আপনিই এটি উঠিয়ে আমার ওপর রেখে দিন। তিনি বলেন, না, এটিও হবে না। এরপর তিনি সেখান থেকে কিছু মালামাল বের করে দিয়ে তারপর আবার ওঠাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও ওঠাতে পারেন নি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কাউকে আদেশ করুন যেন এটি আমাকে তুলে দেয়। তিনি (সা.) বলেন, না। তখন তিনি বলেন, তাহলে আপনিই উঠিয়ে আমার ওপর রেখে দিন। তিনি বলেন, না। এরপর তিনি সেখান থেকে আরো কিছু মালামাল কমিয়ে দেন, তারপর তা উঠিয়ে নিজের কাঁধে রাখেন এবং রওয়ানা হন। তার চলে যাবার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) অবিরত তার পানে তাকিয়ে থাকেন যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান।

প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) সাহাবীদের মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি; তুমি নাও, কিন্তু পরিমিতভাবে নাও। সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, মিতাচার বা পরিমিতিবোধ থাকা উচিত। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাও, অতিরিক্ত নেওয়া উচিত নয়। এ হাদীসের শেষে বর্ণনাকারী এটিও লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) তার এই লোভ দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। এটি অবশ্য বর্ণনাকারীর নিজস্ব ধারণা। এমনও হতে পারে, মহানবী (সা.) তার লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছিলেন না, বরং মহানবী (সা.)-এর সেই দারিদ্র্যের যুগের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যা সাহাবীদের পূর্বের অবস্থা ছিল, আর সেটির কথা চিন্তা করে তিনি দূর পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন যে, কীভাবে এই লোকেরা কুরবানী বা আত্মত্যাগ করতে থেকেছে, কীভাবে তাদের ওপর দারিদ্র্যের দিন কেটেছে এবং আজ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আমাদের অপার দানে ভূষিত করছেন! বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারকও এটিকে বর্ণনাকারীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা বলে আখ্যায়িত করেছেন; এমনটি নয় যে, মহানবী (সা.) একথা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন– সে কেন লোভ করছে? বরং ব্যাখ্যাকারীরা অন্যান্য বিষয়ের কথাই লিখেছেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, কখনো এমন হয় নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি 'না' বলেছেন।

হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন; যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি তা দান করে দিতেন। ইবনে আবি খায়সামা

হযরত আলী (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, তিনি (সা.) দান করার দিক থেকে সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন।

হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা একটি 'বুরদাহ' অর্থাৎ একপ্রকার চাদর নিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি আমি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য। মহানবী (সা.) সেটি গ্রহণ করেন যেন তাঁর এটির প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং সেই চাদরটিই লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করেছিলেন বা বেঁধে রেখেছিলেন। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই চাদরটি আমাকে পরিধান করার জন্য দিয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে। মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে থাকেন, তারপর ভেতরে গিয়ে সেটি ভাঁজ করেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেন। নিজে কাপড় বদলে অন্য চাদর পরে আসেন। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলে, তুমি তাঁর (সা.) কাছে এটি চেয়ে ভালো করো নি। তুমি তো জানো, তিনি কোনো যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি এজন্য চেয়েছি যেন আমি যখন মারা যাব, তখন এটি আমার কাফন হয়। বর্ণিত আছে, হযরত সাহল বলেছিলেন, পরবর্তীতে সেই চাদরটিই তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু আলখাল্লা বণ্টন করেন এবং মাখরামাকে কোনো আলখাল্লা দেন নি। মাখরামা তার ছেলেকে বলেন, হে আমার বৎস! আমার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে চলো। আমি তার সাথে গেলাম। *তার ছেলে মিসওয়ার এটি বর্ণনা করেছেন।* তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে (সা.) আমার কাছে ডেকে আনো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ছোটো ছিলাম, আমি ভেতরে যাই এবং তাঁকে ডেকে জানাই যে, আমার পিতা এসেছেন। তিনি (সা.) তার কাছে আসেন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে একটি আলখাল্লা তাঁর হাতে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, আমি এটি তোমার জন্য তুলে রেখেছিলাম। অর্থাৎ তুমি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলে না? তার অভিযোগ প্রকাশ করার আগেই তিনি চাদরটি তাকে দিয়ে দেন যে, আমি এটি তোমার জন্য সযত্নে তুলে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেই মাখরামার দিকে তাকান এবং বলেন, এই চাদরটি তোমার জন্য। এতে মাখরামা আনন্দিত হয়ে যান। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত মাখরামার কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেন এবং বাইরে চলে আসেন। *ছেলে ভেতরে যাবার পরিবর্তে তিনি (সা.) নিজেই বাইরে চলে আসেন।* তাঁর (সা.) কাছে একটি আলখাল্লা ছিল, তিনি সেটির গুণাবলি বা সৌন্দর্য তাকে দেখাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটি তোমার জন্যই তুলে রেখেছিলাম, আমি এটি তোমার জন্যই তুলে রেখেছিলাম।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, (এশবার) আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যাচ্ছিলাম, তিনি একটি নাজরানী চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন যার পাড় বা কিনারা খসখসে ছিল। এক বেদুইন ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে দেখা করে এবং সে অত্যন্ত জোরে তাঁর চাদর ধরে টান দেয়। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘাড়ের একপাশে দেখলাম, তার অত্যন্ত জোরে টানার কারণে সেই চাদরের কিনারার দাগ তাঁর ঘাড়ে বসে গিয়েছে। তারপর সে বলে, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র যে মাল আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকেও দেবার আদেশ

দিন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার দিকে মনোযোগ দেন এবং হেসে ফেলেন, তারপর তাকে দান করার নির্দেশ দেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ অন্য এক স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদের সাথে মজলিসে বসে কথাবার্তা বলতেন। তারপর তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম, যতক্ষণ না তিনি নিজের ঘরে, অর্থাৎ কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন। তিনি বলেন, একদিন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, তাঁর দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে যাই। আমরা এক বেদুইনকে দেখি যে তাঁকে ধরে তাঁর চাদরের সাহায্যে তাঁকে টান দেয়। এতে তাঁর (সা.) ঘাড়ে লাল দাগ হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সেই চাদরটি খুবই খসখসে ছিল। তারপর মহানবী (সা.) যখন তার দিকে মুখ ফেরান তখন সেই বেদুইন তাঁকে বলে, আমার এই দুটি উটের ওপর আপনি মালামাল বোঝাই করে দিন; কারণ আপনি তো নিজের ধনসম্পদ থেকেও বোঝাই করে দেবেন না এবং আপনার বাবার ধনসম্পদ থেকেও দেবেন না! *সে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে কথা বলে।* বর্ণনাকারী বলেন, এতে মহানবী (সা.) বলেন, না, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; না, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; না, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *তিনি ইস্তিগফারও করেন এবং বলেন,* না, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেবো না; *এমনটি ছিল না যে, দেবেনই না; বরং তিনি এ শর্ত দেন যে, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেবো না* যতক্ষণ না তুমি আমাকে এভাবে টান দেবার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছ। *তুমি যে আমার চাদর টেনেছ এবং আমার ঘাড় জখম করেছ, তার বদলা দাও।* সেই বেদুইন প্রতিবারই বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এর বদলা দেবো না। *অর্থাৎ সে বলে, না, আমি কোনো বদলা দেবো না।* সে বলে, কারণ আপনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নেন না। *সে এই কৌশল অবলম্বন করে; অর্থাৎ সেই বেদুইনও চতুর ছিল যে, আপনি তো মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নেন না, তাই আমার ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি নাহয় মন্দ করেছি, কিন্তু আপনি তো মন্দ করবেন না!* এটি শুনে মহানবী (সা.) হেসে ফেলেন। তারপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তার দুটি উটের একটির ওপর যব এবং অন্যটির ওপর খেজুর বোঝাই করে দাও; দুটিই পূর্ণ করে দাও। তিনি তাকে কেবল ধনসম্পদই দান করেন নি, বরং তার অন্যায় আচরণও ক্ষমা করে দেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমাদের কাছে যদি বাহরাইনের মালামাল আসে, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দেবো। *তিনি দুই হাত একত্রিত করে অঞ্জলি ভরে ইশারা করে বলেছিলেন।* কিন্তু বাহরাইনের ধনসম্পদ আসার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর ওফাত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেই ধনসম্পদ তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে আসে। তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দেন, মহানবী (সা.)-এর জিম্মায় যার কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে, সে যেন আসে। এটি শুনে আমি দাঁড়িয়ে যাই এবং নিবেদন করি, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বাহরাইনের ধনসম্পদ যদি আসে, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দেবো। এতে হযরত আবু বকর দুই হাত জড়ো করে এক অঞ্জলি ভরে (ধনসম্পদ) দেন। তারপর আমাকে বলেন, এটি গণনা করো। আমি গণনা করে দেখি সেখানে পাঁচশ দিরহাম ছিল। তারপর তিনি বলেন, এর দ্বিগুণ আরো নিয়ে নাও। হযরত আলা বিন হাযরামী, যাকে

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি বাহরাইন থেকে এই ধনসম্পদ পাঠিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর পরেও হযরত আলা এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হারুন বিন রিয়াব বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে সত্তর হাজার দিরহাম আসে। এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ যা তাঁর কাছে এসেছিল। তারপর এই ধনসম্পদ একটি চাটাইয়ের ওপর রাখা হয়। এরপর তিনি (সা.) তা বণ্টন করার জন্য দাঁড়ান এবং যে যাচনাকারীই এসেছিল, তাকে তিনি খালি হাতে ফেরান নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সম্পদের পুরোটাই বণ্টন করে দেন। এই রেওয়ায়েতে এমনটিই রয়েছে। তবে এর চেয়েও বেশি ধনসম্পদ অন্যান্য সময়ে আসতে থেকেছে। *সম্ভবত বর্ণনাকারীর জ্ঞান অনুযায়ী এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদ; অথবা যে সময়ে এই বর্ণনাটি দেওয়া হচ্ছিল সে সময় পর্যন্ত এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি সম্পদ। কারণ এর পূর্বের যে বর্ণনাটি রয়েছে, তদনুযায়ী বাহরাইন থেকে যে ধনসম্পদ এসেছিল– তা এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) ধার করে তাকে অর্ধেক ওয়াসাক খাদ্যশস্য দেন। *এক ওয়াসাক প্রায় ষাট সা'-র সমান, আর এক সা' প্রায় আড়াই সেরের সমান।* এরপর যিনি ধার দিয়েছিল, সে পাওনা চাইতে আসে। তখন মহানবী (সা.) তাকে এক ওয়াসাক শস্য দেন এবং বলেন, **এর অর্ধেক তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য, আর বাকি অর্ধেক তোমার জন্য উপহারস্বরূপ।** *এটিই ঋণ পরিশোধের উত্তম পদ্ধতি। তার কাছ থেকে আধা ওয়াসাক শস্য (ধার) নিয়েছিলেন, কিন্তু (পরিশোধ করার সময়) ঋণদাতাকে পুরো এক ওয়াসাক দেন। এটি হলো ঋণ ফেরত দেবার সর্বোত্তম উপায়। আসল ঋণ ফেরত দিতেও গড়িমসি ও টালবাহানা করা উচিত নয়।*

হযরত সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর জন্য কালো রঙের একটি উলের জুব্বা প্রস্তুত করা হয়েছিল। একদিন তিনি সেই জুব্বা পরে সাহাবীদের কাছে আসেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি দেখছ না, এটি কত সুন্দর? তখন একজন গ্রাম্যলোক বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিবেদিত! এই জুব্বাটি আমাকে দান করুন। মহানবী (সা.)-এর কাছে কখনো কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন না। মহানবী (সা.) নিজের জুব্বাটি খুলে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেন।

চমৎকার এটি রেওয়ায়েত রয়েছে; হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একজন কাপড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চার দিরহাম দিয়ে একটি জামা ক্রয় করেন। সেই জামাটি পরে তিনি (সা.) বাইরে বের হন। তখন একজন আনসার বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এই জামাটি পরিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেবেন। মহানবী (সা.) সঙ্গে সঙ্গে জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দেন। এরপর তিনি আবার দোকানদারের কাছে যান এবং আরও চার দিরহাম দিয়ে আরেকটি জামা ক্রয় করেন। তাঁর কাছে দুই দিরহাম অবশিষ্ট থাকে। *তাঁর (সা.) কাছে তখন মোট দশ দিরহাম ছিল। প্রথম জামাটি চার দিরহামে কিনেছিলেন, পরে দ্বিতীয় জামাটিও চার দিরহামে ক্রয় করেন। ফলে দুই দিরহাম অবশিষ্ট থাকে।* ফিরে আসার পথে তিনি (সা.) এক ক্রীতদাসীকে কাঁদতে দেখেন। তিনি (সা.) তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে দুই দিরহাম দিয়েছিল আটা কিনে আনার জন্য। কিন্তু আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। তখন মহানবী (সা.) নিজের কাছে থাকা অবশিষ্ট শেষ দুই

দিরহামও তাকে দিয়ে দেন। সে আবার কাঁদতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এখন কাঁদছ কেন? তোমার কাছে তো এখন দুই দিরহাম গেছে; যাও, আটা কিনে নিয়ে যাও। সে বলে, আমার ভয় হচ্ছে, এত দেরি হবার কারণে বাড়ির লোকেরা আমাকে মারবে। তখন মহানবী (সা.) তার সাথে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। (সেখানে গিয়ে) তিনি তাদেরকে সালাম দেন। তারা তাঁর কণ্ঠস্বর চিনলেও উত্তর না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। তিনি দ্বিতীয়বার সালাম দেন, তবুও বাড়ির লোকেরা নীরব থাকে। তিনি তৃতীয়বার সালাম দেন। তখন তারা তাঁর সালামের উত্তর দেয়। তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি প্রথমবার সালাম শুনতে পাও নি? তারা বলে, জি, আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম– আপনি আমাদের জন্য শান্তির দোয়া দিতেই থাকুন। *বার বার সালাম দিন, যেন আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয়।* এটি ছিল সাহাবীদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা! এরপর তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি কেন এসেছেন? তিনি (সা.) বলেন, এই মেয়েটি ভয় পাচ্ছিল যে, তোমরা তাকে মারবে। তখন সেই ক্রীতদাসীর মালিক বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সঙ্গে আপনার আগমনের কারণে আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এই দাসীকে মুক্ত করে দিলাম। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে কল্যাণ ও জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই দশ দিরহামের মধ্যে এত বরকত দান করেছেন যে, এর মাধ্যমে তিনি তাঁর নবীকেও জামা পরিধান করিয়েছেন, একজন আনসারীকেও জামা পরিধান করিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে একজন ক্রীতদাসীকেও মুক্ত করিয়েছেন।

হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ এক থোকা আঙুর পেশ করেন এবং এটাও বর্ণনা করা হয় যে, সেটি এক ছড়া খেজুর ছিল। *প্রথমে এক বর্ণনায় আঙুরের কথা এসেছে, আবার আরেক বর্ণনায় খেজুর রয়েছে।* যাহোক, বলা হয় যে, এরপর একজন সাহায্যপ্রার্থী আসলে মহানবী (সা.) সেটি তাকে দিয়ে দেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) সেই সাহায্যপ্রার্থীর কাছ থেকে তা এক দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। *যে থোকাটি তিনি (রা.) এনেছিলেন, সেটি কোনো বিশেষ জাতের হবে বা উন্নতমানের খেজুর হবে হয়ত।* তিনি (রা.) তা সেই অভাবী ব্যক্তির কাছ থেকে এক দিরহাম দিয়ে কিনে পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন। এরপর সেই সাহায্যপ্রার্থী আবার আসে, তখন তিনি (সা.) তাকে আবার সেটি দিয়ে দেন। আর এভাবে এই ঘটনাটি তিনবার ঘটে। *হযরত উসমান (রা.) কিনে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করতেন, আর সেই সাহায্যপ্রার্থী এসে আবার চাইত আর তিনি (সা.) তাকে তা দিয়ে দিতেন।* অবশেষে মহানবী (সা.) অত্যন্ত নম্রতার সাথে সেই সাহায্যপ্রার্থীকে বলেন, হে অমুক! তুমি সাহায্যপ্রার্থী নাকি ব্যবসায়ী? তুমি চাইতে এসেছ; কিন্তু সাহায্যপ্রার্থীরা তো এমনটি করে না! তুমি দিরহামও উপার্জন করে যাচ্ছো আর এভাবে ব্যাবসা করছ। তিনি (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেন নি, কিন্তু গভীর প্রজ্ঞার সাথে উপদেশ প্রদান করেন যে, তুমি যা করছ তা সমীচীন নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন যায়েদ বিন সা'নাকে হিদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন তখন যায়েদ বিন সা'না বলেন, নবুওয়তের যতগুলো লক্ষণ ছিল– তার সবই আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় দেখতে পেয়েছি; কেবল দুটি বিষয় ছাড়া, যা আমি বুঝতে পারি নি যে, তা তাঁর (সা.) মধ্যে আছে কি না? তার মধ্যে একটি হলো, এই নবীর ধৈর্য ও সহনশীলতা তাঁর রাগের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, তাঁর সাথে যতই অসভ্য বা নিষ্ঠুর আচরণ করা হোক না

কেন– তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ততই বৃদ্ধি পাবে। আর আমি সেই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলাম যে, কোনো সুযোগ পেলে এই লক্ষণ দুটিও পরীক্ষা করে দেখব।

যাহোক, পরীক্ষা করা তো ভিন্ন কথা। কিন্তু সুযোগটি এভাবে তৈরি হয় যে, যায়েদ বিন সা'না বলেন, একদিন মহানবী (সা.) ঘর থেকে বাইরে আসেন; তাঁর সাথে আলী বিন আবি তালিবও (রা.) ছিলেন। এমন সময় একজন আরোহী আসে যাকে বেদুইন অর্থাৎ গ্রাম্য মনে হচ্ছিল। সে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অমুক গোত্রের বুসরা গ্রামের লোকেরা মুসলমান হয়ে গেছে। আর আমি তাদের বলেছিলাম, তারা যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তারা পর্যাপ্ত রিযক লাভ করবে। এখন তারা অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ ও খরার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তারা আবার লোভ ও লালসার বশে ইসলাম ত্যাগ না করে বসে, যেভাবে তারা রিযকের প্রাচুর্যের লোভে মুসলমান হয়েছিল। আপনি যদি দয়া করেন এবং সমীচীন মনে করেন, তাহলে তাদের কাছে কিছু পাঠিয়ে তাদের সাহায্য এবং মনস্তুষ্টি করুন।

মহানবী (সা.) সেই লোকটির দিকে তাকান। তাঁর সাথে হযরত আলীও (রা.) ছিলেন; তিনিও নিবেদন করেন, এখন তো এমন কোনো জিনিস নেই যা সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাঠানো যেতে পারে। যায়েদ বিন সা'না বলেন, আমি তাঁর নিকটে যাই; *আমি লক্ষ করছিলাম, আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম;* এবং বলি, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি অমুক গোত্রের বাগানের খেজুর একটি নির্ধারিত পরিমাণ এবং নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে বিক্রি করতে পারেন? মহানবী (সা.) বলেন, হে ইহুদী! *সা'না তখনো ইহুদী ছিলেন।* নির্ধারিত পরিমাণ এবং মেয়াদের শর্তে খেজুর বিক্রি করতে পারি বটে, কিন্তু এই শর্ত মানতে পারব না যে, এই খেজুর অমুক গোত্রের অমুকের বাগানেরই হবে। আমি বলি, ঠিক আছে। অতএব, তিনি (সা.) আমার সাথে চুক্তি করেন। আমি আমার থলে খুলে তাঁকে (সা.) অগ্রিম হিসেবে আশি মিসকাল সোনা দিয়ে দিই যে, অমুক সময়ে আপনি আমাকে এত পরিমাণ খেজুর দিয়ে দেবেন। *এক মিসকাল প্রায় সোয়া চার গ্রামের সমান।* মহানবী (সা.) সেই স্বর্ণ ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেন, *যিনি সাহায্যের জন্য এসেছিলেন;* এবং বলেন, এগুলো বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দাও এবং এর দ্বারা তাদের সাহায্য করো। যায়েদ বিন সা'না বলেন, নির্ধারিত সময়ের তখনও দুই-তিন দিন বাকি ছিল, এমন সময় আমি তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁর (সা.) জামার কলার ধরে এবং চাদর টেনে ধরে খুবই রাগত স্বরে বলি, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবেন না? আল্লাহ্‌র কসম! আমি বনু আব্দুল মুত্তালিবের এই বদভ্যাস খুব ভালো করেই জানি যে, তারা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ, আর আপনাদের টালবাহানার অভ্যাসও আমার জানা আছে! *যদিও এমন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যাহোক, সে শত্রু ছিল। তখন তো মনে মনে শত্রুতাই ছিল অথবা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। যাহোক, সে এমনটিই করে। আর সে এ-কথা বলে যে, আমার এই অভিজ্ঞতা আছে।* তিনি বলেন, সে-সময় আমি উমর (রা.)-র দিকে দেখছিলাম, যিনি পাশেই ছিলেন। রাগের কারণে তাঁর চোখ এমনভাবে ঘুরছিল যেভাবে ঘূর্ণায়মান চরকা ঘোরে। তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) চরম রাগতস্বরে, বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে এমন কথা বলছ যা আমি শুনছি, আর এমন অভদ্র সাথে আচরণ করছ যা আমি দেখছি। সেই খোদার কসম, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! যদি তাঁর ভয় না থাকত, তাহলে আমি আমার তরবারি দিয়ে তোমার মস্তক ছিন্ন করতাম। অথচ মহানবী (সা.) খুবই শান্ত ও স্বস্তির

সাথে উমরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মুচকি হাসছিলেন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! এই রাগের পরিবর্তে আমি এবং সে, আমরা দুইজন এর বেশি অধিকার রাখি যে, তুমি আমাকে উত্তমভাবে (ঋণ) পরিশোধের জন্য এবং তাকে উত্তমভাবে তাগাদা দেবার জন্য বলবে। হে উমর! একে নিয়ে যাও এবং একে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দাও; বরং বিশ সা' অতিরিক্ত খেজুরও দিয়ে দিও। আমি বলি, হে উমর! এই অতিরিক্ত (খেজুর) কীসের জন্য? তিনি উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তোমার প্রতি যে কঠোর আচরণ করেছি, তার বিনিময়ে যেন তোমাকে অতিরিক্ত প্রদান করি। আমি উমর (রা.)-কে বলি, আপনি কি জানেন, আমি কে? উমর (রা.) বলেন, না! আপনি কে? আমি বলি, আমি যায়েদ বিন সা'না। উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সেই 'হিবর', অর্থাৎ ইহুদীদের বড়ো আলেম? আমি উত্তরে বলি, হ্যাঁ, ইহুদীদের আলেম। তখন উমর (রা.) বলেন, এতো বড়ো আলেম হয়েও মহানবী (সা.)-এর সাথে এমন অসভ্যতামূলক বা অসম্মানজনক পন্থা তুমি কেন অবলম্বন করলে? আমি উত্তরে বলি, হে উমর! নবুওয়তের যতগুলো লক্ষণ ছিল, যখন আমি তাঁকে (সা.) দেখি তখন তা তাঁর মাঝে দেখতে পাই; শুধু দুটি লক্ষণ ছাড়া– যেগুলো আমি জানতে পারি নি। প্রথমত, এই নবীর সহিষ্ণুতা কি তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পায়? দ্বিতীয়ত, যত বেশি তাঁর সাথে তিক্ত ও অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করা হবে, তিনি তত বেশি ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করবেন। তাই আমি এই দুটি বিষয় যাচাই করেছি। হে উমর! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি আল্লাহ্‌কে আমার প্রভু-প্রতিপালক, ইসলামকে আমার ধর্ম, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আমার নবী হিসেবে গ্রহণ করায় সন্তুষ্ট। আর আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, *যেহেতু আমি একজন সম্পদশালী মানুষ, তাই* আমার অর্ধেক সম্পদ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য সদকা (উৎসর্গ) করছি। তখন উমর (রা.) বলেন, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কিছু লোকের জন্য বলো, কারণ পুরো উম্মতের তো কোনো হিসেবই নেই; তাদের জন্য এই সম্পদ কীভাবে যথেষ্ট হতে পারে? আমি বলি, আচ্ছা, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের জন্য সদকাস্বরূপ। অতঃপর যায়েদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। এভাবে যায়েদ মহানবী (সা.)-এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং বয়আত করেন আর অনেক যুদ্ধে তাঁর (সা.) সাথে অংশগ্রহণ করেন; এমনকি তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই যায়েদের (রা.) মৃত্যু হয়। তিনি ইহুদী আলেম ছিলেন, তার স্বভাব পবিত্র ছিল এবং তিনি তাঁকে (সা.) দেখে, সকল লক্ষণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এটি হলো মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের মাধুর্য! কেননা শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে একটি জাতিকে ক্ষুধার তাড়না থেকেই মুক্তি দেন নি, বরং নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র, মাধুর্য দিয়ে একজন ইহুদী আলেমকেও মুসলমান বানিয়ে ফেলেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)